ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১ অক্টোবর

শচীন দেব বর্মন

সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক শচীন দেব বর্মন। শচীনকর্তা নামে তিনি সুপরিচিত। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর কুমিল্লায়। পরবর্তীকালে স্থায়ী বসতি আগরতলা-ত্রিপুরা। বাবা সম্মানিত মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর।

শচীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে ত্রিপুরার রাজদরবারে চাকরি নেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। পরে চাকরি ত্যাগ করে সংগীতের জন্য কলকাতায় যান। ওস্তাদ বাদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁসহ সে সময়ের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছে রাগসংগীতের তালিম নেন। কাব্যসংগীত ও লোকসংগীতের সুর ও লয়কে সমন্বিত করে কণ্ঠসংগীতের এক স্বকীয় শৈলী উদ্ভাবন করেন তিনি। লোকসংগীত ও রাগসংগীত নিজস্ব ঢঙে গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বেতারে তাঁর গান প্রথম পরিবেশিত হয়। ১৯৩৭ সালে ‘রাজগী’ চলচ্চিত্রে প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন। ৮০টিরও বেশি বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে মুম্বাইয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানকার চলচ্চিত্র ‘শিকারী’, ‘দেবদাস’, ‘সুজাতা’, ‘বন্দিনী আরাধনা’, ‘পিয়াসা’ প্রভৃতিতে সুরযোজন করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর কণ্ঠসংগীতের সংখ্যা ১৩১, একক কণ্ঠে ১২৭টি ও মীরা দেববর্মণের সঙ্গে চারটি দ্বৈতসংগীতের রেকর্ড রয়েছে। ১৯৫৮ সালে সংগীত-নাটক আকাদেমি ও লন্ডনের এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি এবং ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কার পান তিনি। ‘সরগমের নিখাদ’ শিরোনামে দেশ পত্রিকায় সংগীত বিষয়ে তাঁর সাধনা ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র সংগীতশিল্পী মীরা দেবী তাঁর স্ত্রী ও সুরকার রাহুল দেব বর্মন তাঁর ছেলে। ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২ অক্টোবর

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অভিনেতা, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৮৮৯ সালের ২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার রামরাজাতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গাবাসী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএ এবং ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট ও বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। প্রথম অভিনয় ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে। ১৯২১ সালে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে তাদের সঙ্গে মতানৈক্য হলে মঞ্চ ছেড়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' ও 'চন্দ্রনাথে'র চিত্রায়ণে একই সঙ্গে পরিচালক ও অভিনেতার ভূমিকায় কাজ করেন। একটি নাট্যদল গঠন করে ১৯২৩ সালে শিশিরকুমার নাট্যমঞ্চে ফিরে আসেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা নাটকে রামচন্দ্রের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ে অভিভূত হয়ে অমৃতলাল বসু তাঁকে থিয়েটারের নবযুগের প্রবর্তক বলে ঘোষণা করেন। এ নাটকে তিনি কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, আসনব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস, প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু-ধূপের গন্ধ, পাদপ্রদীপের পরিবর্তে আলোক-সম্পাত এবং সিনের পরিবর্তে বক্সসেট প্রয়োগ করেন। শিশিরকুমার অভিনীত বিখ্যাত চরিত্রগুলো হলো : রঘুপতি ও জয়সিংহ (বিসর্জন), যোগেশ (প্রফুল্ল), জীবানন্দ (ষোড়শী), নাদির শাহ (দিগ্বিজয়ী), নিমচাঁদ (সধবার একাদশী) ও চন্দ্রবাবু (চিরকুমার সভা)। তিনি ১৯৪২ সালে 'শ্রীরঙ্গম' নামে একটি রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে 'বিশ্বরূপা থিয়েটার' নামে পরিচিত। রঙ্গামঞ্চের কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার বহু যুবককে পেশাদার নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কথা ছিল এর চেয়ে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করা ভালো। এ বছরেরই ৩০ জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৩ অক্টোবর

বারীণ মজুমদার

সংগীতবিশারদ বারীণ মজুমদার ১৯২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাবনা জেলার রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিশেন্দ্রনাথ মজুমদার, মা মণিমালা মজুমদার। ছেলের গানের প্রতি আগ্রহ দেখে জমিদার বাবা লখনউ থেকে ওস্তাদ নিয়ে এসেছিলেন। বারীণ মজুমদার লখনউয়ের মরিস কলেজ অব মিউজিক থেকে সংগীতে স্নাতক ও 'সংগীতবিশারদ' খেতাব অর্জন করেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, অধ্যাপক জে এন নাটু, ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ, ওস্তাদ খুরশীদ আলী খাঁ, চিন্ময় লাহিড়ী, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছেও তালিম নেন তিনি। ১৯৫২ সালের জমিদারি হুকুম দখল আইনে তাঁদের বসতভিটাসহ সব সম্পত্তি সরকারি দখলে চলে গেলে ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। ওই বছরই তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে উচ্চাঙ্গসংগীতের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ঢাকায় কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি শুধু রাগসংগীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মণিহার সংগীত একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে সংগীতকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁর অবদান ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতবিষয়ক পরীক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। 'সংগীত কলি' ও 'সুর লহরী' নামে দুটি বই তিনি রচনা করেছেন। সুর সপ্তক নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। স্বাধীনতা পদক (২০০১, মরণোত্তর), একুশে পদকসহ দেশে-বিদেশে নানা সম্মাননায় তিনি ভূষিত হন। আগ্রা ও রঙ্গিলা ঘরানার এই সংগীতসাধক ২০০১ সালের ৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৪ অক্টোবর

ভো নগুয়েন গিয়াপ

ভিয়েতনাম যুদ্ধ জয়ের প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন অন্যতম সমরবিদ জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ। ভিয়েতনামে কিংবদন্তিতুল্য কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনের পরই গিয়াপের স্থান। তাঁর পরিকল্পনায়ই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ভিয়েতনাম ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৯১১ সালের ২৫ আগস্ট ঔপনিবেশিক ভিয়েতনামে (ফরাসি ইন্দোচীন) কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৪ বছর বয়সে তিনি উপনিবেশবিরোধী গোপন প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। গিয়াপ হ্যানয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ওপর লেখাপড়া করেন। একই সঙ্গে তিনি স্কুলেও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ১৯৩৮ সালে তিনি হো চি মিনের ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। জাপানি আগ্রাসনের মুখে ১৯৩৯ সালে তিনি পালিয়ে চীন চলে যান এবং হো চি মিনের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তিনি ভিয়েতনামিদের নিয়ে একটি সৈন্যদলও গঠন করেন। জাপানি দখলদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে ১৯৪৪ সালে তিনি ঔপনিবেশিক ভিয়েতনামে (ইন্দোচীন) ফিরে আসেন।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর হো চি মিন গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম গঠনের ঘোষণা দেন এবং গিয়াপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে সুসজ্জিত একটি আগ্রাসী সেনাদলের বিরুদ্ধে নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জনসমষ্টির প্রতিরোধ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে প্রত্যেক গ্রামবাসীই হচ্ছে একজন যোদ্ধা, গ্রামগুলো হচ্ছে দুর্গ।

১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুতে তাঁর নেতৃত্বেই এক অভিযান শেষে ফ্রান্সের সেনারা পিছু হটে। ১৯৫৪ সালের ৭ মে ফরাসি বাহিনী পরাজয় মেনে নিলে সেখানে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। ১৯৬৮ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় তিনি ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এ জন্য তাঁকে মার্কিন খেদাও আন্দোলনের মূল পরিকল্পনাকারীও বলা হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এর ছয় বছর পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। সামরিক কৌশলের ওপর গিয়াপ অনেকগুলো বইও লিখেছেন। ২০১৩ সালের ৪ অক্টোবর হ্যানয়ের একটি সামরিক হাসপাতালে তিনি মারা যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৫ অক্টোবর

আবুল হাশিম

উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবুল হাশিমের জন্ম ১৯০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলের কাশিয়াড়া গ্রামে এক জমিদার পরিবারে। তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেও পরিচিত। তাঁর বাবা আবুল কাশেম বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা ছিলেন। আবুল হাশিম ১৯২৩ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেও সেখানে পড়ালেখায় মন বসছিল না বলে বর্ধমানে ফিরে আসেন। বর্ধমানে এসে তিনি রাজ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে আইএ ও ১৯২৮ সালে বিএ পাস করেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ওপর ডিগ্রি নিয়ে তিনি বর্ধমান আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৩৬ সালে আবুল হাশিম বর্ধমান থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫২ সালে তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনে ভূমিকার কারণে ওই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ১৯৬০ সালে 'ইসলামিক একাডেমি'র প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। একপর্যায়ে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতিসত্তার যে বিকাশ ঘটে, তিনি ছিলেন তার অন্যতম তাত্ত্বিক। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ইসলামী তত্ত্বের লেখক হিসেবে খ্যাত আবুল হাশিম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- The Creed of Islam (1950), রব্বানীর দৃষ্টিতে (১৯৭০), In Retrospection (1974), 'Let Us Go to War' I 'As I See It'. ১৯৭৪ সালের **৫ অক্টোবর** তিনি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
৬ অক্টোবর

মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ সাহা ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইনের উক্তি ছিল, 'Dr. M N Shaha has won an honoured name in the whole scientific world.' মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর বিক্রমপুর জেলার সাওড়াতলী গ্রামে। অভাবের সংসারে জন্ম। বাবা জগন্নাথ সাহা ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ১৯০৫ সালে মেঘনাদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তবে বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) প্রতিবাদ সভায় যোগ দেওয়ার কারণে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর ভর্তি হন ঢাকা জুবিলী স্কুলে। ১৯০৯ সালে তিনি পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়ে এন্ট্রান্স পাস করেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১১ সালে আইএসসিতে তৃতীয় এবং ১৯১৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ বিএসসিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৮ সালে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগ দেন। আলোর চাপের ওপর গবেষণা করে ১৯১৯ সালে তিনি ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। 'অ্যাস্ট্রাফিজিকস'-এর ওপর গবেষণা করে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান ১৯২০ সালে। ১৯২৩ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একই বছর তিনি কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তাপের প্রভাবে কিভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয় এ তত্ত্বটি তাঁর। এ ছাড়া পরমাণুবিজ্ঞান, আয়নমণ্ডল, পঞ্জিকা সংস্কার, বন্যার প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' নামক বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক। কলকাতায় 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস' (১৯৪৮) তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এটির নামকরণ করা হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস'। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'The Principle of Relativity', 'Treatise on Heat', 'Treatise on Modern Physics', 'Junior Textbook of Heat With Meteorology'। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে তিনি আকস্মিক মারা যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৭ অক্টোবর

রাজনারায়ণ বসু

চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮২৬ সালের ৭ **সেপ্টেম্বর** পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়ার গ্রামে। কলকাতার গুরু পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। পরে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুহৃদ ছিলেন। ছাত্রজীবনে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের বস্তুবাদী জীবনদর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বাবা ও প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ১৮৪৬ সালে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন রাজনারায়ণ। কঠ, কেন, মুন্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তিনি। ১৮৪৯ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮৬৮ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষাদানের জন্য মেদিনীপুরে তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয় ও নারীশিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংগীতের উন্নতি, দেশি প্রথায় ব্যায়াম ও দেশি ওষুধ ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি।

রাজনারায়ণের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (প্রথম ভাগ-১৮৫৫, দ্বিতীয় ভাগ-১৮৭০), ব্রাহ্ম সাধন (১৮৬৫), ধর্মতত্ত্বদীপিকা (দুই খণ্ড), আত্মীয় সভার সদস্যদের বৃত্তান্ত (১৮৬৭), হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে (১৮৭৩), সেকাল আর একাল (১৮৭৪), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড ১৮৮২)। এ ছাড়া অনেক ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করেছেন। ভগবদ্ভক্ত রাজনারায়ণ বসু 'ঋষি'ও পেয়েছিলেন। রাজনারায়ণ ছিলেন সাহিত্য সমালোচক। মাইকেল মধুসূধন দত্ত তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। মাইকেল স্বীকার করেন যে রাজনারায়ণের সমালোচনার প্রভাব তাঁর কবিতার ওপর পড়েছিল। রাজনারায়ণ বসু ১৮৯৯ সালের **১৮ সেপ্টেম্বর** মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পর তাঁর আত্মজীবনী 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৮ অক্টোবর

ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন

আব্দুল মতিন ১৯২৬ সালের ৩ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার ধুবালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আব্দুল জলিল, মা আমেনা খাতুন। বাবা ভারতের দার্জিলিংয়ে চাকরিতে গেলে সেখানে তাঁর স্কুলজীবন শুরু। তিনি দার্জিলিং গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবং ১৯৪৫ সালে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি ব্রিটিশ আর্মির কমিশন র‍্যাংকে উত্তীর্ণ হলেও বেঙ্গালুরু পৌঁছানোর পর যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ফলে সার্টিফিকেট নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মাস্টার্স করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তিনি। পরে তিনি ছাত্র ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং সংগঠনটির সভাপতি হন। এরপর কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯৫৪ সালে পাবনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হন। মওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করলে ১৯৫৭ সালে তাতে যোগ দেন। পরে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি (পুনর্গঠিত) ও শেষে বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। আমৃত্যু এই পার্টির কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বাঙালি জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন কী এবং কেন, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। এ ছাড়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই, জীবন পথের বাঁকে বাঁকে। তিনি জীবদ্দশায় নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন এবং ২০০১ সালে একুশে পদক পান। ২০১৪ সালের ৮ অক্টোবর তিনি মারা যান। তিনি মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দান করেছেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
৯ অক্টোবর

কাজী মোতাহার হোসেন

শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট, ঢাকা কলেজ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে পরিসংখ্যানে ডিপ্লোমা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ‘পরীক্ষণ প্রকল্প’ বিষয়ক গবেষণার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এ গবেষণায় তিনি নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যা ‘হোসেনের শৃঙ্খল নিয়ম’ নামে পরিচিত। ছাত্র অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ডেমোনস্ট্রেটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে অধ্যাপক হন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সংখ্যাতত্ত্ব ও তথ্যগণিত’ বিষয়ে এমএ কোর্স চালু করেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ছিলেন। ১৯৬১ সালে অবসর নিলেও তিন বছর পরিসংখ্যান বিভাগের ‘সুপারনিউমেরারি প্রফেসর’ ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ‘ইমেরিটাস প্রফেসর’ ও ১৯৭৫ সালে ‘জাতীয় অধ্যাপক’ হন। তিনি ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কিছুদিন এর মুখপত্র ‘শিখা’ সম্পাদনা করেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে—‘সঞ্চয়ন’, ‘নজরুল কাব্য পরিচিতি’, ‘সিম্পোজিয়াম’ ও ‘গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস’। ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতা পদক পান। ভালো দাবাড়ু ছিলেন। ১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১০ অক্টোবর

এস এম সুলতান

শিল্পী এস এম সুলতানের পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ সুলতান। তবে এস এম সুলতান নামেই তিনি পরিচিত। ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট নড়াইলের মাছিমদিয়ায় তাঁর জন্ম। পরিবারের লোকজন শৈশবে তাঁকে লাল মিয়া বলে ডাকত। সামর্থ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁর বাবা ১৯২৮ সালে তাঁকে নড়াইলের ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। পাঁচ বছর চলে সেই শিক্ষা। এরপর বাবার সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে সেসব দালানের ছবি আঁকা। ইচ্ছা ছিল কলকাতায় গিয়ে ছবি আঁকা শিখবেন। পরে এলাকার জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ রায় সাহায্যের হাত বাড়ান, সুলতান ১৯৩৮ সালে কলকাতায় যান। তিন বছর আর্ট কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ফ্রিল্যান্স চিত্রশিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

সুলতান ছিলেন স্বাধীনচেতা ও প্রকৃতিপ্রেমিক। ১৯৪৩ সালে খাকসার আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে সিমলায় তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়। ভারত-পাকিস্তান ভাগের পর সুলতান নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৫৩ সালে নিজ গ্রামে শিশুদের জন্য ‘শিশুস্বর্গ’ ও ‘চারুপীঠ’ নামে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। ১৯৭৬ সালে শিল্পকলা একাডেমিতে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। ১৯৮২ সালে তিনি একুশে পদক পান। ১৯৮৪ সালে শিল্পকলা একাডেমি তাঁকে আবাসিক শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২ সালে তাঁকে এশিয়ার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর এস এম সুলতান যশোর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১০ অক্টোবর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংকশনসহ ১৯৪৩ সালে বিএ পাস করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ভর্তি হলেও শেষ করেননি।

ফেনী হাই স্কুলে পড়ার সময়ই ওয়ালীউল্লাহর লেখালেখি শুরু। এ সময় তিনি হাতে লেখা পত্রিকা ‘ভোরের আলো’ সম্পাদনা করেন। তাঁর প্রথম গল্প ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়ই তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি ‘কন্টেম্পোরারি’ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার ‘দৈনিক স্টেটসম্যান’ পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। দেশভাগের পর তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক ও পরে করাচি কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ও ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেসকোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালান এবং বিশ্ব জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি ফরাসি নাগরিক অ্যান মেরিকে বিয়ে করেন। স্ত্রী মেরি তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৯৪৮) ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে এটি ‘Tree Without Roots’ (১৯৬৭) নামে ইংরেজিতেও অনূদিত হয়। ‘লালসালু’ ছাড়া তাঁর আরো দুটি উপন্যাস ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) ও ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮)। চেতনাপ্রবাহ রীতি ও অস্তিত্ববাদ ধারণাকে তিনি উপন্যাসগুলোতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়া দুটি গল্পগ্রন্থ ‘নয়নচারা’, ‘দুই তীর’ ও অন্যান্য গল্প এবং তিনটি নাটক ‘বহিপীর’, ‘তরঙ্গভঙ্গ’ ও ‘সুড়ঙ্গ’ বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কারের পাশাপাশি ১৯৮৩ সালে সরকার ওয়ালীউল্লাহকে মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয় এবং সেখানে মদোঁ-স্যুর বেল্ভুতে তিনি সমাহিত হন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১১ অক্টোবর

নীলিমা ইব্রাহিম

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী নীলিমা ইব্রাহিম ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রফুল্ল কুমার রায় চৌধুরী আইনজীবী ছিলেন। মা কুসুম কুমারী দেবী সামাজিক নানা কার্যক্রমে অংশ নিতেন।

তাঁর পারিবারিক নাম ছিল নীলিমা রায় চৌধুরী। বিয়ের পর তাঁর নামের সঙ্গে ইব্রাহিম যুক্ত হয়। তিনি খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন থেকে আইএ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীদের মধ্যে প্রথম 'বিহারীলাল মিত্র গবেষণা' বৃত্তি পেয়ে বাংলা সাহিত্যে এমএ করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি লাভ করেন। একই বছর তিনি ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতার লরেটো হাউসে প্রভাষক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে যোগ দেন। পরে বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক (১৯৭৪-৭৫) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ ও নারী উন্নয়ন সংস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলা একাডেমির ফেলো, এশিয়াটিক সোসাইটি, ইতিহাস সমিতি, রেড ক্রস সমিতি ও বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ—'শরৎ-প্রতিভা', 'বাংলার কবি মধুসূদন', 'বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা', 'বেগম রোকেয়া'। অন্যান্য লেখার মধ্যে ছোটগল্প গ্রন্থ—'রমনা পার্কে', উপন্যাস—'বিশ শতকের মেয়ে', 'এক পথ দুই বঁকি'। 'বিন্দু-বিসর্গ' নামে আত্মজীবনী লিখেছেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ নানা সম্মাননা পেয়েছেন। ২০০২ সালের ১৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১২ অক্টোবর

কামিনী রায়

কবি ও সমাজকর্মী কামিনী রায় ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা চন্ডীচরণ সেন পেশায় বিচারক ছিলেন। তিনি ঔপন্যাসিকও ছিলেন। কামিনী রায় আট বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি কলকাতার বেথুন ফিমেল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, বেথুন কলেজ থেকে এফএ ও সংস্কৃতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। বেথুনে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন, পরে অধ্যাপক হন। সরকারি চাকুরে কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে ১৮৯৪ সালে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯০৯ সালে স্বামীকে হারান তিনি।

কামিনী রায় সমাজ ও নারীর কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি নারীশ্রমিক তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আলো ও ছায়া’ ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়; ভূমিকা লিখেছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘নির্মাল্য’, ‘পৌরাণিকী’, ‘গুঞ্জন’ (শিশুকাব্য), ‘মাল্য ও নির্মাল্য’, ‘অশোক-সংগীত’ (সনেট), ‘অম্বা’ (নাট্যকাব্য), ‘বালিকা শিক্ষার আদর্শ’, ‘ঠাকুরমার চিঠি’, ‘দীপ ও ধূপ’ এবং ‘জীবনপথে’ (সনেট)। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট।

‘করিতে পারি না কাজ/সদা ভয় সদা লাজ/সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/পাছে লোকে কিছু বলে’—লাইনগুলো এতটাই বিখ্যাত যে তাঁর ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি প্রবাদসম হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগত্তারিণী পদক’ লাভ করেন। ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৩ অক্টোবর

ইলা মিত্র

কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায়। তাঁর বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল। মায়ের নাম মনোরমা সেন। ইলা মিত্র ১৯৪০ সালে বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই কলেজ থেকে ১৯৪২ সালে আইএ এবং ১৯৪৪ সালে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। এর প্রায় ১৪ বছর পর ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এমএ পাস করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পর্যায়ক্রমে যুক্ত হন গার্লস স্টোরস কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি সংগঠনের সঙ্গে। বিবাহসূত্রে ১৯৪৫ সালে তাঁকে চলে আসতে হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরে। সেখানে তিনি মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ও নানা রকম সামাজিক সেবামূলক কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার ১৯টি জেলায় গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। তিনি নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। ইলা মিত্র ক্রমেই হয়ে ওঠেন সাঁওতাল ও অন্যান্য কৃষকের 'রানী মা'।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তিনি জনমত সংগঠিত করতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গেও তিনি চারবার (১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত) কারাবরণ করেন; যদিও ভারত সরকার তাঁকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' হিসেবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অ্যাথলেটিকসে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করে। এ ছাড়া 'হিরোশিমার মেয়ে' গ্রন্থানুবাদের জন্য তিনি সোভিয়েতের ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার লাভ করেন। ইলা মিত্রের অসাধারণ সাহস ও সংগ্রামীজীবন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন লেখায়, কবিতায়, পত্রিকার প্রতিবেদনে ইলা মিত্রের সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকার কথা উপমা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর কলকাতায় ইলা মিত্রের জীবনাবসান ঘটে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১৪ অক্টোবর

ই ই কামিংস

মার্কিন সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা কবি ই ই কামিংস। ১৮৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যামব্রিজে জন্ম। হার্ভার্ডে ইংরেজি ও ধ্রুপদ সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করার সময় ১৯১৫ সালের দিকে তিনি একই সঙ্গে ছবি আঁকা ও লেখার কাজ শুরু করেন। পরে দীর্ঘ প্যারিস প্রবাসের সময় তাঁর ওপর দাদা ও সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ছবি আঁকার পারদর্শিতাকে তিনি কবিতায়ও প্রয়োগ করেন। শব্দকে যথেচ্ছ ভেঙে, অস্থানে জুড়ে ও কাগজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মুদ্রণ করে তিনি কবিতার দৃশ্যরূপ রচনা করতে শুরু করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় যতিচিহ্নের সচেতন বিপর্যয় ও ইংরেজি বর্ণমালার ক্যাপিটাল লেটার বর্জন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্স থেকে স্বদেশে যুদ্ধবিরোধী চিঠিপত্র লিখতেন। চিঠিতে সমালোচনামূলক মন্তব্যের জন্য তাঁকে ফ্রান্সের এক শিবিরে বন্দি করে রাখা হয়। ওই শিবিরের অভিজ্ঞতাই তাঁকে 'দ্য এনর্মাস রুম' নামের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লিখতে প্রণোদনা জোগায়, যা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। প্যারিসে বসবাস করার সময় তাঁর লেখা 'টিউলিপস অ্যান্ড চিমনিজ' নামের একক কবিতার সংকলনও প্রকাশিত হয়। এটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। বছর তিনেক আগে কামিংসের একটি অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে জোরালো বিতর্ক শুরু হয় যখন জানা যায় কবিতাটিতে তিনি নিগ্রো শব্দটি ছয়বার ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে বর্ণবাদী বলতেও দ্বিধা করেনি। ১৯৬২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৫ অক্টোবর

এ পি জে আবদুল কালাম

পরমাণুবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের পুরো নাম আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন আবদুল কালাম।

তিনি ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে এক তামিল পরিবারে জন্ম। তাঁর বাবা জয়নুল আবেদিন নৌকার আয় দিয়ে সংসার চালাতেন। মায়ের নাম অশিয়াম্মা। আবদুল কালাম স্কুল-কলেজ পেরিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক করেন। মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে বিমান প্রযুক্তি বিষয়েও শিক্ষা নেন। ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংগঠনে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দিয়ে একটি ছোট হোভারক্রাফটের নকশা তৈরি করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় যোগ দেন। সেখানে তিনি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী যানের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। ১৯৯৮ সালের 'পোখরান-২' ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণার জন্য তিনি 'ভারতের মিসাইল মানব' হিসেবে পরিচিতি পান। ২০০২ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনে আবদুল কালাম ১১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। পাঁচ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৮১ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৯০ সালে পদ্ম বিভূষণ ও ১৯৯৭ সালে ভারতরত্ন উপাধি পান। মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আরো অনেক দেশি-বিদেশি সম্মাননা পেয়েছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'উইংস অব ফায়ার' কোটি কোটি পাঠককে সংগ্রামী জীবনের সাহস জুগিয়ে থাকে। ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই মেঘালয়ের শিলংয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই দিনই সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে ভারত সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৫ অক্টোবর

মারিও পুজো

মারিও পুজোর পুরো নাম মারিও জিয়ানলুইগি পুজো। তিনি বিশিষ্ট ইতালীয়-আমেরিকান কথাসাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার। আমেরিকার মাফিয়াদের নিয়ে রচিত 'গডফাদার' (১৯৬৯) উপন্যাসের জন্য তিনি বহুলভাবে সমাদৃত। উপন্যাসটি অবলম্বনে তৈরি 'গডফাদার' চলচ্চিত্রের জন্য তিনি সেরা চিত্রনাট্য বিভাগে একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। জন্ম ১৯২০ সালের ১৫ অক্টোবর নিউ ইয়র্কে, দরিদ্র এক অভিবাসী পরিবারে। স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। তবে ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে তাঁকে সরাসরি যুদ্ধের বদলে জার্মানিতে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম ছোটগল্প 'দ্য লাস্ট ক্রিসমাস' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য ডার্ক আরেনা' (১৯৫৫)। তিনি দীর্ঘদিন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে লেখক-সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। আগের দুটি বই থেকে অর্থ আসেনি। তাই তিনি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'দ্য গডফাদার' লেখেন। পাল্প ম্যাগাজিনে কাজ করার সুবাদে তিনি মাফিয়াদের ব্যাপারে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপন্যাসটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় ছিল দীর্ঘদিন। পরে উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপ দেন ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপলা, যা ১১টি ক্যাটাগরিতে অস্কার মনোনয়ন লাভ করে এবং তিনটিতে জয়ী হয়। পুজো উপন্যাস, ছোটগল্প, চিত্রনাট্যের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। ১৯৯৯ সালের ২ জুলাই তিনি মারা যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১৫ অক্টোবর

আবুল হসেন

আবুল হুসেন ছিলেন প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ, সমাজসংস্কারক। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ সালের ৬ জানুয়ারি যশোরের পানিসারা গ্রামে মামার বাড়িতে। তাঁদের পৈতৃক নিবাস যশোরের কাউরিয়া গ্রামে। বাবা হাজি মোহাম্মদ মুসা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম।

১৯১৪ সালে আবুল হুসেন যশোর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ ও বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২০ সালে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি আইন বিষয়েও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। কলকাতার হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২১ সালে তিনি সেখানে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রভাষক পদে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় যোগ দেন। বাংলার বিধানসভায় গৃহীত 'ওয়াক্ফ আইন'-এর মূল খসড়া তিনিই লিখে দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। মুক্তবুদ্ধি চর্চা ছিল এ সংগঠনের অন্যতম আদর্শ। এ সংগঠনের সদস্যরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' আবুল হুসেন ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তাঁদের সাধনার ফলে মুসলমান যুবসমাজের মধ্যে উদার মননশীলতার প্রসার ঘটে। এ সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা' (১৯২৭-১৯৩১)। আবুল হুসেনের লেখা 'বাংলার বলশী' (১৯২৫), 'বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা' (১৯২৮) ও 'মুসলিম কালচার' (১৯২৮) বই তিনটি খুব খ্যাতি পায়। মুক্তবুদ্ধি ও উদার চিন্তার অধিকারী আবুল হুসেন ছিলেন এ দেশে অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমি থেকে আবুল হুসেন রচনাবলি নামে তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশিত হয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৮ সালের ১৫ অক্টোবর কলকাতায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৬ অক্টোবর

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

কবি ও গীতিকার রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার মোংলা থানার মিঠাখালী গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। 'রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' নামটি তিনি নিজে গ্রহণ করেন। মা শিরিয়া বেগম। বাবা শেখ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন চিকিৎসক। রুদ্র ঢাকা ওয়েস্টএন্ড হাই স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে বিএ অনার্স (বাংলা) ও ১৯৮৩ সালে এমএ পাস করেন। ছাত্রজীবনেই তাঁর দুটি কাব্য 'উপদ্রুত উপকূল' (১৯৭৯) ও 'ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম' (১৯৮১) প্রকাশিত হয়। এ দুটি কাব্য তাঁকে কবিখ্যাতি এনে দেয়। তিনি তাঁর সময়ের সংস্কৃতিকে নিজ কবিতায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত। রুদ্রর জনপ্রিয় কবিতা 'আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই/আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি'। গভীর ইতিহাস-চেতনার ছাপ স্পষ্ট। কাব্যচর্চার পাশাপাশি সংগীত, নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনাতেও সমান উৎসাহী ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ছোবল', 'দিয়েছিলে সকল আকাশ', 'মৌলিক মুখোশ'; গল্পগ্রন্থ 'সোনালি শিশির' ও নাট্যকাব্য 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮০ সালে তিনি মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯১ সালের ২১ জুন রুদ্র ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৬ অক্টোবর

মনোরমা বসু

মনোরমা বসু স্বদেশি আন্দোলনের নেত্রী, নারী সংগঠক, সমাজসেবক। ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর বরিশালের বানারীপাড়ায় জন্ম। মাত্র ১১ বছর বয়সে ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী হন। ১৪ বছর বয়সে বরিশালের জমিদার চিন্তাহরণ বসুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর সমর্থন পেয়ে তিনি স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। নিজে পড়ালেখা বেশি করতে পারেননি। তাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্বার্থে জমিদারবাড়ি ছেড়ে বরিশালে চলে আসেন। কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। নারী অধিকার রক্ষায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘সরোজ নলিনী মহিলা সমিতি’র শাখা বাংলাদেশের প্রথম নারী সংগঠন হিসেবে গণ্য। এ ছাড়া তিনি বিধবা ও কুমারীদের সাহায্যের জন্য ‘মাতৃমন্দির আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্থানীয় ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র (বরিশাল শাখা) প্রতিষ্ঠাতা। ‘বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ’-এর বরিশাল শাখা তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পল্লীকল্যাণ অমৃত পাঠাগার, মুকুল মিলন খেলাঘর ইত্যাদি নানা সংগঠন তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত। চৌষট্টির গণ-আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীদের সংগঠিতকরণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। দেশপ্রেম, সমাজসেবা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে অনেকেই তাঁকে ‘মাসিমা’ বলে ডাকতেন। ১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর তিনি মারা যান। তাঁর জীবদ্দশায়ই সত্যেন সেনের ‘মনোরমা মাসিমা’ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৭ অক্টোবর

আর্থার মিলার

খ্যাতিমান মার্কিন নাট্যকার, প্রাবন্ধিক আর্থার মিলারের পুরো নাম আর্থার আশার মিলার। তিনি ১৯১৫ সালের ১৭ অক্টোবর আমেরিকার নিউ ইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবার নাম ইসিডোর মিলার ও মা অগাস্টা মিলার। ইসিডোর মিলার ভাগ্যান্বেষণে পোল্যান্ড থেকে আমেরিকায় যান এবং জামাকাপড়ের একটি কারখানা গড়ে তোলেন। ১৯৩১ সালে বিশ্বজুড়ে ওয়াল স্ট্রিটে (শেয়ারবাজার) দরপতন হলে তাঁর ব্যবসা ভেঙে পড়ে। তখন আর্থার মিলারের বয়স ১৪ বছর। মিলার আব্রাহাম লিংকন হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৩৮ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ পাস করেন। মিশিগানে পড়ার সময় মিলার ছাত্রদের কাগজ মিশিগান ডেইলির রিপোর্টার ও নৈশকালীন সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন। এ সময় তিনি প্রথম নাটক ‘নো ভিলেন’ লেখেন। সাত দশক ধরে মিলার লেখালেখি করেছেন। তাঁর বিখ্যাত মঞ্চনাটকের মধ্যে রয়েছে ‘অল মাই সন্স’ (১৯৪৭), ‘ডেথ অব এ সেলসম্যান’ (১৯৪৯), ‘দ্য ক্রুশিবল’ (১৯৫৩) ও ‘এ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিজ’ (১৯৫৫)। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের জন্য তিনি প্রচুর চিত্রনাট্য লিখেছেন। ১৯৪৯ সালে ‘ডেথ অব এ সেলসম্যান’ নাটকের জন্য তিনি পুলিতজার পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে মিলার নাটক ‘ব্রোকেন গ্লাস’ লেখেন। হলিউডের বিখ্যাত নায়িকা মেরিলিন মনরো তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ২০০৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৮৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১৮ অক্টোবর

ইলা মিত্র

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলা মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর, কলকাতায়। তাঁর বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। মা মনোরমা সেন। ইলা মিত্র বেথুন স্কুল ও কলেজ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, আইএ ও অনার্সসহ বিএ পাস করেন। ১৯৪৪ সালে বিএ পাসের প্রায় ১৪ বছর পর ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এমএ পাস করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পর্যায়ক্রমে যুক্ত হন গার্লস স্টোরস কমিটি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। বিয়ের পর ১৯৪৫ সালে তিনি চলে আসেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরে। সেখানে তিনি মেয়েদের শিক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে যুক্ত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। তিনি নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেন। তিনি হয়ে ওঠেন কৃষকদের ‘রানি মা’। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন তিনি। রাজনৈতিক কারণে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চারবার (১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত) কারাবরণ করেন; যদিও ভারত সরকার ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ হিসেবে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার অ্যাথলেটিকসে অবদানের জন্য তাঁকে সম্মাননা দেয়। ‘হিরোশিমার মেয়ে’ বইয়ের অনুবাদের জন্য তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পান। ইলা মিত্রের সংগ্রামী জীবন বাংলা অঞ্চলের প্রগতিশীল মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১৮ অক্টোবর

সূর্য সেন

বিপ্লবী সূর্য সেনের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কুয়েপাড়ায়। বাবার নাম রমণীরঞ্জন সেন। মায়ের নাম শশীবালা সেন। পড়ালেখা শুরু স্থানীয় দয়াময়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ছিলেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ১৯১২ সালে চট্টগ্রামের নন্দনকাননের ন্যাশনাল স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯১৮ সালে বিএ পাস করে তিনি নন্দনকাননের ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। মাস্টারদা পরিচিতি তাঁর এভাবেই পাওয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে তিনি অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী সংগঠনে কাজ শুরু করেন। পরে বিপ্লবী দল 'যুগান্তর'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে বিপ্লবীরা নিজেদের গোপন সংগঠন ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সংগঠনের স্বার্থে অর্থ ছিনতাই করার এক ঘটনায় সূর্য সেন ও অম্বিকা ধরাও পড়েন। অবশ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মামলা খারিজ হয়ে যায়। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন সূর্য সেন। তাঁর নেতৃত্বেই চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা অভ্যুত্থান ঘটায়- যার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ ইংরেজ সরকারকে ক্ষুব্ধ করে। তারা সূর্য সেনকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রচুর অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁকে ধরতে এসেই নির্মল সেনের গুলিতে নিহত হন ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গৈরলা গ্রামে লুকিয়ে থাকার সময় এক নিকটাত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়েন তিনি। সূর্য সেনের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইংরেজ সরকার হাজির করতে পারেনি। এর পরও ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
১৯ অক্টোবর

সালাহ্উদ্দীন আহমদ

শিক্ষাবিদ, মুক্তচিন্তক, ইতিহাসবিদ এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহমদ ১৯২০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে এমএ করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি করেন। ছাত্রজীবনে তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৮ সালে জগন্নাথ কলেজের প্রভাষক হিসেবে চাকরি শুরু করেন তিনি। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তিনি ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ওই বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কয়েক বছর সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—সোশ্যাল আইডিয়াস অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ ইন বেঙ্গল : ১৮১৮-১৮৩৫, বেঙ্গালি ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দ্য এমারজেন্স অব বাংলাদেশ : অ্যান ইনট্রোডাকটরি আউটলাইন, হিস্টরি অ্যান্ড হেরিটেজ : রিফ্লেকশনস অন সোসাইটি পলিটিক্স অ্যান্ড কালচার অব সাউথ এশিয়া, বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বরণীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন সুহৃদ, উনিশ শতকে বাংলার সমাজচিন্তা ও সমাজ বিবর্তন এবং ইতিহাস ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র। ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হন সালাহ্উদ্দীন আহমদ। একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

১৯ অক্টোবর

ফররুখ আহমদ

মুসলিম রেনেসাঁর কবি বলে খ্যাত ফররুখ আহমদের জন্ম ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে। বাবা সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। খুলনা জিলা স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক ও কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আইএ পাস করেন ফররুখ। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েন। ছাত্রজীবনে বামপন্থী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেও চল্লিশের দশকে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিবর্তন আসে। ভারত ভাগ আন্দোলনও তিনি সমর্থন করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মাসিক 'মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি কলকাতা থেকে চলে এসে ঢাকা বেতারে যোগ দেন। তাঁর রচনায় ধর্মীয় ভাবধারার প্রভাব দেখা যায়। এ ছাড়া আরবি ও ফারসি শব্দের প্রাচুর্য তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (সেপ্টেম্বর), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১)। শিশুতোষ রচনার মধ্যে আছে 'পাখির বাসা', 'হরফের ছড়া', 'চাঁদের আসর' প্রভৃতি। তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদক ও ১৯৬৬ সালে পান আদমজী ও ইউনেসকো পুরস্কার। ফররুখ আহমদ ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৭ ও ১৯৮০ সালে তাঁকে যথাক্রমে মরণোত্তর একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২০ অক্টোবর

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা'- অমর এ গানের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে তিনি গীতিকার ও গায়ক অতুলপ্রসাদ সেন। ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকায় জন্ম। তবে পৈতৃক আদিনিবাস ফরিদপুরের দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে বেড়ে ওঠেন অতুল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পাস করেন। তারপর কলকাতা ও রংপুরে কিছুদিন আইন ব্যবসা করে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে থিতু হন এবং আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গানের সুর ও ভাব আধুনিক বাংলা গানকে করেছে সমৃদ্ধ। রচিত গানের সংখ্যা দুই শর কিছু বেশি। তার ভগবতসংগীত, প্রকৃতি ও প্রেমগীতি বড় গভীর, মর্মস্পর্শী। তিনি গানে বাউল ও কীর্তনের সুর যোগ করেন। এ ছাড়া বাংলা কাব্যগীতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন না করে তিনি হিন্দুস্তানি সংগীতের সুর ও ঢঙের সার্থক যোজনা করেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর গান স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর গানগুলো 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) গ্রন্থে ও স্বরলিপি 'কাকলি' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়। পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা তাঁর গানে স্বদেশপ্রেম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্ণৌতে শহরে তাঁর নামে সড়ক ও বিশ্ববিদ্যালয় 'হল'-এর নামকরণ হয়েছে। তিনি 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থের বড় অংশ তাঁর জীবদ্দশায় লোকসেবায় ব্যয়িত হতো। অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করে গেছেন। ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট লক্ষ্ণৌতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

২১ অক্টোবর

লীলা নাগ

লীলা নাগ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক অগ্নিকন্যা। পূর্ব বাংলার নারী আন্দোলনেরও পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। জন্ম আসামের গোয়ালপাড়ায় ১৯০০ সালের ২১ অক্টোবর। বাবা গিরীশচন্দ্র নাগ ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর পিতৃপরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত পরিবার। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করায় তাঁকে 'পদ্মাবতী' স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। বাবার ঢাকায় বদলির সুবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে দীপালি সঙ্ঘ নামে সংগঠন গড়ে তিনি 'দীপালি স্কুল'সহ ১২টি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলেন। ১৯২৫ সালে তিনি 'শ্রীসঙ্ঘ' নামে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি গোপন বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯২৮ সালে মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড গঠন করেন তিনি। 'জয়শ্রী' নামের নারীবিষয়ক একটি প্রকাশনাও তিনি সম্পাদনা করেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তিনি ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ বিপ্লবী অনীল রায়কে বিয়ে করেন এবং দুজনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দলে যোগ দিয়ে গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক। ১৯৪০ সালে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের বাহ্যিক আকৃতি নষ্ট করার দায়ে এই দম্পতিকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কারাগারে কাটাতে হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৭০ সালের ১১ জুন জীবনাবসানের আগ পর্যন্ত তিনি গণমানুষের কল্যাণে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন যাপন করেছেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

২২ অক্টোবর

জীবনানন্দ দাশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে। বাবা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাস কবি ছিলেন।

জীবনানন্দ দাশ ১৯১৫ সালে ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেন। ১৯২২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৭ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৯ সালে দিল্লির রামযশ কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৩০ সালে দেশে ফিরে আসেন। প্রায় পাঁচ বছর বেকার থাকার পর ১৯৩৫ সালে বরিশালের বিএম কলেজে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছু আগে তিনি সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, ‘রূপসী বাংলা’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘সাতটি তারার তিমির’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’। এ ছাড়া বহু অগ্রন্থিত কবিতাও রয়েছে। শুধু কবি নন, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবেও তিনি স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রাপ্ত অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে, ‘মাল্যবান’, ‘সুতীর্থ’, ‘জলপাইহাটি’, ‘জীবনপ্রণালী’, ‘বাসমতীর উপাখ্যান’ ইত্যাদি। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা দুই শতাধিক। ‘কবিতার কথা’ নামে তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। তাঁর ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থ নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত (১৯৫৩) হয়। এ ছাড়া ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ গ্রন্থটিও ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৪) লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৩ অক্টোবর

পেলে

ব্রাজিলের বিখ্যাত ফুটবলার পেলে। পুরো নাম এদসোঁ আরাঁচ দু নাসিমেঁতু। ব্রাজিলের হয়ে তিনি ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তিনি ব্রাজিলের জাতীয় দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও তিনবার বিশ্বকাপজয়ী একমাত্র ফুটবলার।

পেলের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর ব্রাজিলে। তিনি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ১৯৫৭ সালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ১৬ বছর ৯ মাস বয়সে ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম গোল করে পেলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার সম্মান পান। ১৯৫৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে পেলে তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেন। ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের সেই ম্যাচটি ছিল প্রতিযোগিতার তৃতীয় খেলা। সেই বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ (এবং তখন পর্যন্ত যেকোনো বিশ্বকাপ খেলায় সর্বকনিষ্ঠ) ছিলেন তিনি। ওয়েলসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে করা গোলটি ছিল প্রতিযোগিতায় পেলের প্রথম এবং ম্যাচের একমাত্র গোল। এর কারণে ব্রাজিল সেমিফাইনালে ওঠে। ম্যাচের সময় পেলের বয়স ছিল ১৭ বছর ২৩৯ দিন। ১৯৭০ সালে আগের বিশ্বকাপের ব্যর্থতা মুছে ফেলে আবারও শিরোপা জিতে নেয় ব্রাজিল। টানা চারটি বিশ্বকাপের তিনটিরই ট্রফি ওঠে তাদের হাতে। পেলে খেলেন তাঁর চতুর্থ বিশ্বকাপের শেষটি। ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দেন। দল তিনবার শিরোপা জেতায় জুলে রিমে ট্রফিটি একেবারেই দিয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিলকে। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন পেলে। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপের মধ্য দিয়ে নিজেকে সর্বকালের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে প্রমাণ করেন পেলে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৩ অক্টোবর

শামসুর রাহমান

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর। বাবা মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মা আমেনা বেগম। বাবার বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলী গ্রামে। তিনি পুরান ঢাকার পোগজ স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৪৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। শামসুর রাহমান পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে ১৯৫৭ সালে কর্মজীবন শুরু করেন দৈনিক মর্নিং নিউজে। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে দৈনিক পাকিস্তানে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে সামরিক সরকারের শাসনামলে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

শামসুর রাহমান বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে নানা ছদ্মনাম নিয়েছেন, যেগুলো হচ্ছে, সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক। শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার। এর মধ্যে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক, জীবনানন্দ পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার, মিতসুবিসি পুরস্কার (সাংবাদিকতার জন্য), স্বাধীনতা পদক, আনন্দ পুরস্কার উল্লেখযোগ্য।

ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৪ অক্টোবর

মান্না দে

বাংলা গানের কিংবদন্তিতুল্য শিল্পী মান্না দে। তিনি বাংলা ছাড়াও হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটিসহ নানা ভাষায় গান গেয়েছেন। তাঁর ৬০ বছরের শিল্পীজীবনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান রেকর্ড করেছেন।

মান্না দে ১৯১৯ সালের ১ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম ছিল প্রবোধচন্দ্র দে। বাবা পূর্ণচন্দ্র দে, মা মহামায়া দে। ছোট্ট স্কুল ইন্দু বাবুর পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা শুরু। পরে স্কটিশ গির্জা কলেজিয়েট স্কুল ও স্কটিশ গির্জা কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে ও ওস্তাদ দবির খানের কাছে গানের তালিম নেন। স্কটিশ কলেজে পড়ার সময়ই তিনি সহপাঠীদের গান শুনিয়ে মাতিয়ে রাখতেন। আন্ত কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে তিন বছর তিনটি আলাদা শ্রেণি-বিভাগে প্রথম হন। ১৯৪২ সালে তিনি শচীন দেব বর্মনের অধীনে কাজ করতে শুরু করেন। পরের বছর ‘তামান্না’ চলচ্চিত্রে গায়ক হিসেবে অভিষেক ঘটে তাঁর। এরপর বিখ্যাত অনেক সুরকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁর ‘কফি হাউসের আড্ডাটা আজ আর নেই’, ‘ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোরেঙ্গে’ কিংবা ‘সবাই তো সুখী হতে চায়’-এর মতো অসংখ্য গান কালজয়ী হয়ে থাকবে। ২০০৫ সালে তাঁর আত্মজীবনী ‘জীবনের জলসাঘরে’ প্রকাশিত হয়। পরে বইটি ইংরেজিতে ‘মেমোরিজ কাম অ্যালাইভ’, হিন্দিতে ‘ইয়াদেন জি ওথি’ ও মারাঠি ভাষায় ‘জীবনের জলসাঘরে’ নামে অনূদিত হয়েছে। তাঁর জীবন নিয়ে ‘জীবনের জলসাঘরে’ নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। ‘মান্না দে সংগীত একাডেমি’ মান্না দের সম্পূর্ণ আর্কাইভ বিকশিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ পুরস্কার পদ্মবিভূষণসহ অনেক পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জনপ্রিয় এই শিল্পী আমাদের ছেড়ে চলে যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

২৫ অক্টোবর

পাবলো পিকাসো

পাবলো পিকাসো বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, কবি ও নাট্যকার। তিনি ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহণ করেন। পিকাসোর বাবাও ছিলেন চারুকলার শিক্ষক। পিকাসোর ফিগার ড্রয়িং ও তেলচিত্রের আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি বাবার কাছেই।

পিকাসো ১৮৯৭ সালে মাদ্রিদের রয়াল একাডেমিতে পড়তে যান। ১৯ বছর বয়সেই তিনি শিল্প সমালোচকদের নজর কাড়েন। ১৯০৪ সালে মাদ্রিদে পড়াশোনা শেষে প্যারিসে চলে যান এবং আমৃত্যু প্যারিসেই ছিলেন। কিউবিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পিকাসো। ১৯১০ সালের মধ্যেই কিউবিস্ট অঙ্কনশৈলী তাঁর চেষ্টায় পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর আঁকাআঁকির সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—ব্লু পিরিয়ড (১৯০১-০৪), রোজ পিরিয়ড (১৯০৪-০৬), আফ্রিকান-ইনফ্লুয়েন্সড পিরিয়ড (১৯০৭-০৯), অ্যানালিটিক কিউবিজম (১৯০৯-১২) ও সিনথেটিক কিউবিজম (১৯১২-১৯)। বলা হয়ে থাকে—পিকাসো, অঁরি মাতিস ও মার্সেল ডাম্প বিশ শতকের শুরুতে প্লাস্টিক আর্টে বৈপ্লবিক উন্নতির মাধ্যমে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, প্রিন্টমেকিং ও মৃৎশিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। পিকাসোর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের মধ্যে আছে—দ্য ব্লু রুম, ওল্ড গিটারিস্ট, সালত্যাঁবাঁক, সেলফ-পোর্ট্রেট, টু নুডস, আভা গার্দ রমণীরা, থ্রি মিউজিশিয়ান্স, থ্রি ডান্সারস, গিটার, গ্লাস অব আবস্যাঁৎ, সিটেড বাথার ও গোয়ের্নিকা। তিনি যখন কাজ করতেন না তখন মেতে থাকতেন বুলফাইটিং নিয়ে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি তিন শতাধিক কবিতা লিখেছেন। ১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল তিনি প্যারিসে মারা যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৬ অক্টোবর

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

আবুল কাশেম ফজলুল হক উপমহাদেশের স্বনামধন্য রাজনীতিক। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক মহলে ‘শেরেবাংলা’ এবং সাধারণ মানুষের কাছে ‘হক সাহেব’ নামে তিনি পরিচিতি পান। ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বরিশালের সাতুরিয়া গ্রামে মামাবাড়িতে জন্ম। বাবা কাজী মুহম্মদ ওয়াজেদ, মা সাইদুন্নেসা খাতুন। বাড়িতে আরবি ও ফারসিতে সনাতন শিক্ষা নিয়ে তিনি বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ ও বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এমএ করেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে জড়িত হন। একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৪ সালে প্রায় ছয় মাস তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তিনি। ১৯৫৩ সালে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পরের বছর নির্বাচনে জিতে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও পাকিস্তানের গভর্নর তা বাতিল করে দেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন। ১৯৫৮ সালে তাঁকে অপসারণ করা হলে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ‘বেঙ্গল টুডে’ (১৯৪৪) নামে তিনি একটি বই লিখেছেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল রাজনৈতিক এই ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৬ অক্টোবর

মোহিতলাল মজুমদার

কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। বাবা নন্দলাল মজুমদার। বাবার দিক থেকে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং মায়ের দিক থেকে কবি ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তিনি। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলির বলাগড়। তিনি ১৯০৪ সালে বলাগড় স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৯০৮ সালে কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। এরপর কিছুদিন কলকাতার তালতলা স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৯১৪ সালে সরকারি জরিপ বিভাগে কানুনগো পদে চাকরি নেন। তবে তিন বছর পর আবার শিক্ষকতায় ফিরে যান। তিনি ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনাকর্মে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সালে অবসরে যান। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশ ও সম্পদনার কাজেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

কাব্য সাধনায় মোহিতলাল দেহাত্মবাদী। রবীন্দ্রযুগেও তাঁর ভাষা, শব্দ প্রয়োগ ও ছন্দনির্মাণ কৌশলে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। সাহিত্য সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি অনন্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে, 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত গোধূলী'। প্রবন্ধ ও সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য কথা', 'বিচিত্র কথা', 'সাহিত্য বিতান', 'বাংলা কবিতায় ছন্দ', 'বাংলার নবযুগ', 'জয়তু নেতাজী', 'কবি শ্রীমধুসূদন', 'সাহিত্য বিচার', 'বঙ্কিম উপন্যাস', 'রবি-প্রদক্ষিণ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য সাধনার প্রথমার্ধে মোহিতলাল ছিলেন রবীন্দ্র অনুগত। এ জন্য তিনি 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গবাণের শিকার হন। তবে একপর্যায়ে তিনি রবীন্দ্রবিরোধী শিবিরে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথকে খাটো এবং মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বড় লেখক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জুলাই মোহিতলাল কলকাতায় মারা যান।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৭ অক্টোবর

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জাফর আলী আহমদ ছিলেন তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতের আইনজীবী। ১৯১৯ সালে তুফানগঞ্জ স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা এবং ১৯২১ সালে কোচবিহার কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের পরিচিতি দেশজোড়া। আধুনিক গান, স্বদেশি গান, ইসলামী গান, পল্লীগীতি, উর্দু গান- সবই তিনি গেয়েছেন। তবে পল্লীগীতিতে তাঁর মৌলিকত্ব ও সাফল্য সবচেয়ে বেশি। যাত্রা, থিয়েটার ও স্কুল-কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান শুনে তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজ চেষ্টায় গান গাওয়া রপ্ত করেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য তিনি ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গসংগীত শিখেছিলেন। রংপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল চটকা গেয়ে আব্বাসউদ্দীন প্রথমে সুনাম অর্জন করেন। তারপর জারি, সারি, ভাটিয়ালি , মুর্শিদি, বিচ্ছেদি, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালাগান ইত্যাদি গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। তিনি তাঁর দরদভরা সুরেলা কণ্ঠে পল্লীগানের সুর যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা আজও অদ্বিতীয়। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন। আব্বাসউদ্দীন ছিলেন প্রথম মুসলমান গায়ক, যিনি আসল নাম ব্যবহার করে এইচএমভি থেকে গানের রেকর্ড বের করেন। আব্বাসউদ্দীন ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বসবাস করেন। এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের সময় তিনি রেকর্ডিং এক্সপার্ট হিসেবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি সরকারের প্রচার দপ্তরে অ্যাডিশনাল সং অর্গানাইজার হিসেবে চাকরি করেন।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ মোট চারটি বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই চারটি সিনেমা হলো 'বিষ্ণুমায়া', 'মহানিশা', 'একটি কথা' ও 'ঠিকাদার'। 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' আব্বাসউদ্দীনের রচিত একমাত্র গ্রন্থ। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি মরণোত্তর প্রাইড অব পারফরম্যান্স (১৯৬০), শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (১৯৮১) ভূষিত হন। ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর পল্লীগানের এই মহান সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৮ অক্টোবর

বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহি এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাপড়া থানার ডুমুরিয়া গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের (১৯৪৭) পর তাঁদের পরিবার পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার খালিশপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। হামিদুর রহমান খালিশপুর প্রাইমারি স্কুলে এবং পরে স্থানীয় একটি নৈশ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে তিনি সেনানিবাস ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। পরে তিনি মৌলভীবাজার জেলার ধলই নামক স্থানে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন।

পাকিস্তানি সেনাদের ধলই সীমান্ত ঘাঁটির সামরিক গুরুত্বের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা ঘাঁটিটি দখলের পরিকল্পনা করেন। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'সি' কম্পানিকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। হামিদুর রহমান ছিলেন এই কম্পানির সদস্য। ২৪ অক্টোবর রাত থেকে ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলে। ২৮ অক্টোবরের আগের রাতে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি প্লাটুন অতি সন্তর্পণে পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হয়। সংকটময় এ পরিস্থিতিতে হামিদুর রহমান শত্রুর এলএমজি পোস্ট ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রেনেড হাতে রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে শত্রুর এলএমজি পোস্টের দিকে অগ্রসর হন এবং শেষ প্রহরে আক্রমণ করেন। শত্রুপক্ষের কয়েকজনকে হত্যা করলেও নিজে শত্রুপক্ষের গুলিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন (২৮ অক্টোবর ১৯৭১)। দেশের জন্য এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

ধলই সীমান্তে তাঁর শাহাদাতস্থলে পরবর্তী সময়ে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সম্প্রতি তাঁর লাশ ঢাকায় এনে সমাহিত করা হয়েছে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
২৯ অক্টোবর

হীরালাল সেন

বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন ১৮৬৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আইএসসি পড়ার সময় স্টার থিয়েটার আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখেন। সেখান থেকেই চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পড়াশোনা ছেড়ে বায়োস্কোপ চর্চা শুরু করেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু করেন। একই বছর ভোলায় এসডিওর ডাকবাংলোয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ছোট ভাই মতিলাল সেনকে নিয়ে নিজেই গড়ে তোলেন দ্য রয়্যাল বায়োস্কোপ কম্পানি। ১৯০০ সালে বিদেশ থেকে ক্যামেরা ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। মুভি ক্যামেরা শেখার পর তিনি পথঘাট ও সামাজিক অনুষ্ঠানের গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য প্রযোজক, নাট্যকার অমর দত্তের অনুপ্রেরণায় জনপ্রিয় বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেন। সেগুলো ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ সালে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রদর্শন করা হয়। ১৯০৩ সালে প্রথম বাংলায় বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেন হীরালাল সেন। সি কে সেনের মাথার তেল ‘জবাকুসুম’, বটফেস্ট পালের ‘এডওয়ার্ডস টনিক’ ও ডাব্লিউ মেজর কম্পানির ‘সালসা পিলা’ তাঁর নির্মিত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনচিত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল বায়োস্কোপ কম্পানি থেকেই বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো নির্মিত হয়। তিনি ১৯০০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণ করেন। এসব কাজের মাধ্যমেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম পুরুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন হীরালাল সেন। ১৯১৭ সালের ২৯ অক্টোবর কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
৩০ অক্টোবর

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম। বাবা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মা ইন্দুমতী বসুমল্লিক। কাশ্মীর থিওসফিক্যাল হাই স্কুলে তিন বছর পড়েছেন। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন তিনি। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ (ইংরেজি) ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়ে ল কলেজে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। বাবার ল ফার্মে শিক্ষানবিশ হিসেবে কর্মজীবন শুরু। কিছুদিন ইনস্যুরেন্স কম্পানিতেও কাজ করেছেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১২ বছর পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত স্টেটসম্যান পত্রিকায় কাজ করেন। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকে দুই বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গত শতকের তিরিশের দশকে বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেন তিনি। রবীন্দ্রকাব্যধারার বিরোধী অন্যতম কবি। ফরাসি কবি মালার্মের প্রতীকী কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেন তিনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মননশীলতা ও নাগরিক রুচিবোধ তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলা কবিতায় তিনি দর্শনচিন্তার নান্দনিক প্রকাশ ঘটান। বাংলা গদ্যের আধুনিকায়নেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর ‘কাব্যের মুক্তি’ প্রবন্ধকে আধুনিক বাংলা কবিতার ইশতেহার হিসেবে গণ্য করা চলে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ—তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত ও দশমী; গদ্যগ্রন্থ—স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ। প্রতিধ্বনি নামে তাঁর একটি অনুবাদ গ্রন্থ আছে। ১৯৬০ সালের ২৫ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব
৩১ অক্টোবর

ওবায়েদউল হক

দেশের সাংবাদিকতা জগতের আলোকিত মানুষ ওবায়েদউল হক। নিরহংকারী, বিনয়ী, দীপ্তিময় ওবায়েদউল হকের জন্ম ১৯১১ সালের ৩১ অক্টোবর ফেনী জেলায়। তিনি একাধারে লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, প্রযোজক এবং একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ছিলেন। গুণী এই মানুষটি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন পুরো উপমহাদেশেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছিলেন ১৯৩৪ সালে। বাঁধাধরা সরকারি চাকরিতে মন বসাতে পারেননি। ইস্তফা দিয়ে ১৯৪৪ সালে যুক্ত হলেন চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে পটভূমি করে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া'। মুসলমানদের মধ্যে সে সময় তিনিই চলচ্চিত্র নির্মাণের দুর্লভ সাহস দেখিয়েছিলেন। যদিও বাস্তবতার চাপে নিজের নামটি ব্যবহার করতে পারেননি। পরিচালক হিসেবে তাঁর অভিষেক 'হিমাদ্রী চৌধুরী' নামে। এরপর 'দুই দিগন্ত' এবং 'অন্তরঙ্গ' নামে আরো দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এতেই থেমে থাকেননি, পরিচালনা করেছেন নিজের লেখা মঞ্চনাটক 'সায়াহ্নের সংলাপ', 'এই পার্কে'। তাঁর লেখা টেলিভিশনের নাটকগুলোও দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা নাটক 'চোরা বাজার', 'দিক বিজয়ী' ও 'সমাচার এই'। কবিতার বই 'গরীব হতে চাই' ও 'পথের পদাবলী'। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর রম্যরচনার বই 'বাণপ্রস্থের পর' এবং উপন্যাস 'ঢল'। দেশ বিভাগের পর ১৯৫১ সালে যোগ দেন সে সময়ের ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন অবজারভারের সম্পাদক। তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সমিতি ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ওবায়েদউল হক পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইউনিসেফ পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। তিনি ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। গুণী এই মানুষটির জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৩১ অক্টোবর

জন কিটস

ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক কবি জন কিটস। তিনি ১৭৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর লন্ডনের একটি আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন আস্তাবলরক্ষক। ১৮০৪ সালে তাঁর বাবা এবং ১৮১০ সালে মা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিটস প্রথমে এনফিল্ডের এক স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৬ বছর বয়সেই এনফিল্ড স্কুল ত্যাগ করেন। তরুণ বয়স থেকেই তাঁর কবিতা লেখার ঝোঁক ছিল। প্রকৃতির মাঝে ঘুরে বেড়ানো কিংবা রুটিনবদ্ধ জীবনের প্রতি অনভ্যস্ততা তাঁর বাল্যকাল থেকেই তৈরি হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি একটি হাসপাতালে ওষুধবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে লেই হান্ট নামে সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত এক কবির সঙ্গে কিটসের পরিচয় ঘটে। তিনি কিটসের সাহিত্যকর্মের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে লিখতে উৎসাহিত করেন। ১৮১৮ সালে কিটসের ভাই টম যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেই সময় তিনি বন্ধু চার্লস ব্রাউনের বাসায় চলে আসেন। এখানেই কিটস প্রতিবেশী ফ্যানি ব্রন নামে ১৮ বছরের এক তরুণীর প্রেমে পড়েন। এরপর থেকেই মূলত কিটসের সৃষ্টিশীল সময়ের সূচনা হয়।

লর্ড বায়রন ও পার্সি বিশি শেলির সঙ্গে কিটসও ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় প্রজন্মের কবিদের অন্যতম। ১৮২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। মৃত্যুর চার বছর আগে ঢ়ড়বসং শিরোনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বের হয়। এখানেই কিটসের বিখ্যাত কবিতাগুলো রয়েছে। মৃত্যুর পরই সমালোচকরা তাঁর মূল্যায়ন করতে শুরু করেন এবং তিনি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার।

আজকের ব্যক্তিত্ব

৩১ অক্টোবর

শচীন দেববর্মণ

‘কে যাস রে, ভাটি গাঙ বাইয়া’, ‘বাঁশি শুনে আর কাজ নাই’, অথবা ‘বিরহ বড় ভালো লাগে’—এমন অসংখ্য গান আজও যাঁর কণ্ঠে মাতম ঝরায় তিনি শচীন দেববর্মণ। শচীনকর্তা বা এস ডি বর্মণ নামেও তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে সংগীতশিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। জন্ম ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর কুমিল্লায়। বাবা সুগায়ক নবদ্বীপচন্দ্র দেববাহাদুর ছিলেন ত্রিপুরা রাজবংশের সন্তান। শচীন দেবের স্ত্রী মীরা দেবী। একমাত্র পুত্র রাহুল দেববর্মণও খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী। কুমিল্লা জিলা স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়েছেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে ত্রিপুরার রাজদরবারে চাকরি নেন। একদিন চাকরি ছেড়ে গানের টানে কলকাতা চলে যান। ওস্তাদ বাদল খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁসহ সমকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের কাছে তিনি রাগসংগীতের তালিম নিয়েছেন। কাব্যসংগীত ও লোকসংগীতের সুর ও লয়কে সমন্বিত করে কণ্ঠসংগীতের এক স্বকীয় শৈলী উদ্ভাবন করেন তিনি। ১৯২৩ সালে কলকাতা বেতারে প্রথম তাঁর গান পরিবেশিত হয়। ৮০টিরও বেশি বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে মুম্বাইয়ে বসবাস শুরু করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর কণ্ঠসংগীতের সংখ্যা ১৩১টি, একক কণ্ঠে ১২৭টি ও মীরা দেববর্মণের সঙ্গে চারটি দ্বৈতসংগীতের রেকর্ড রয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জসীমউদ্দীনের রচিত লোকসংগীত নিজে সুরারোপ করে গেয়েছেন ও রেকর্ডিং করেছেন। ১৯৫৮ সালে সংগীত-নাটক আকাদেমি ও লন্ডনের এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি তাঁকে বিশেষ সম্মাননা দেয়। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকারের ‘পদ্মশ্রী’ খেতাব পান। তাঁর লেখা ‘সরগমের নিখাদ’ গ্রন্থে সংগীত জীবনের অনেক স্মৃতিচারণা রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।